بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ এপ্রিল, ২০২৫ মোতাবেক ০৪ শাহাদাত, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

রমজানের আগে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর যে দিকগুলি যুদ্ধ সম্পর্কিত, সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছিল এবং এই প্রসঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের ঘটনাবলি আলোচনা করা হচ্ছিল। আজও আমি এই বিষয়ে কিছু বর্ণনা করব। খায়বার বিজয়ের আনন্দের সাথেই সেই দিনগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য আরেকটি আনন্দের বিষয় ছিল, যা সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমি বলতে পারব না যে, আমি খায়বারের বিজয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছি, নাকি এর জন্য। আর তা ছিল হযরত জাফরের আবিসিনিয়া থেকে অভিবাসীদের সাথে ফেরত আসা।

যেমনটি আমরা জানি যে, মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানকার কিছু মুসলমান হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে তাঁর (সা.) চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবি তালেবও ছিলেন। হুদাইবিয়া সন্ধির পর মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরীকে নাজ্জাশীর কাছে একটি পত্র দিয়ে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন যাতে লেখা ছিল যে, এখন যত হিজরতকারী মুসলমান সেখানে রয়েছেন, তাদেরকে মদীনায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। অতএব প্রবাসে চৌদ্দ-পনেরো বছর কাটানোর পর এই লোকেরা দুটি জাহাজে করে মদীনায় পৌঁছেন এবং যখন তারা জানতে পারেন যে, তিনি (সা.) খাইবারের দিকে গিয়েছেন, তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে দ্রুততম সময়ে সাক্ষাতের ব্যকুলতায় অস্থির হয়ে তারা মদীনায় না থেকে খাইবারের দিকে চলে যান। মহানবী (সা.) হযরত জাফরকে দেখে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন। দুই চোখের মাঝে কপালে চুম্বন করেন এবং বলেন,

ما ادری بایهما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر (মা আদরী বি আইয়্যিহিমা আনা আসাররু বিফাতহি খাইবার আম বিকুদূমি জাফর) অর্থাৎ, আমি জানি না এই দুই বিষয়ের মধ্যে কোনটিতে আমি বেশি আনন্দিত, খাইবারের বিজয়ে নাকি জাফরের আগমনে। এই লোকদের সাথে হযরত আবু মূসা আশআরীও তার গোত্রের পঞ্চাশেরও অধিক লোকের সাথে পৌঁছেছিলেন। হযরত আবু মূসা আশআরীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস এবং তিনি আশআরী গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি তার গোত্রের কিছু লোকের সাথে মক্কায় এসেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার তার গোত্রের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর কিছু সময় পর তার দুই ভাই এবং গোত্রের প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের সাথে মদীনার দিকে হিজরত করার জন্য সমুদ্র পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু যাত্রাপথে ঝড়ের কারণে তাদের জাহাজ আবিসিনিয়ার উপকূলে থামতে বাধ্য হয় এবং আবিসিনিয়ায় তাদের সাক্ষাৎ হয় হযরত জাফরের সাথে আর তারাও সেখানে থাকা আরম্ভ করেন। আর এখন যখন জাফর মদীনায় আসার জন্য প্রস্তুত হন, তখন আশআরী গোত্রের এই মুসলমানরাও তার সাথে ছিলেন। এদের পাশাপাশি দাউস গোত্রের কিছু লোকও এসে পৌঁছায়। এদের মধ্যে হযরত

আবু হুরায়রা এবং তুফায়েল বিন আমর ও তার সঙ্গীরা ছিলেন। আশজা গোত্রের কিছু লোকও চলে আসে। মহানবী (সা.) এই সমস্ত আগন্তুকদেরকেও খাইবারের সম্পদ থেকে কিছু না কিছু দান করেন।

জাহাজ আরোহীদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত জাফর এবং তার সাথে অন্যান্য মুসলমানগণ জাহাজের মাধ্যমে ভ্রমণ করে পৌঁছেছিলেন, তাই তাদেরকে "আসহাবুস্ সাফিনাহ" বা জাহাজারোহী বলা হতো। যখন তারা মদীনায় পৌঁছেন, তখন পনেরো বছরের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং এখানকার মুহাজির মুসলমানরা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতেও অগ্রগামী ছিলেন। তাই মনে হয় তাদের মধ্যে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল যে, আমরা তাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, অর্থাৎ যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান এখানকার মুহাজিররা যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মদীনায় এসেছিলেন। একবার হযরত জাফরের স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার সাথে দেখা করতে উপস্থিত হন। সেখানে হযরত উমরও যান এবং জিজ্ঞেস করেন যে, এই মহিলা কে? হযরত হাফসা বলেন, তিনি আসমা বিনতে উমাইস। হযরত উমর বলেন, ওহ, সেই আবিসিনিয়াবাসী, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যে এসেছে। হযরত আসমা বলেন, জ্বী হ্যাঁ। এতে হযরত উমর বলেন, আমরা মদীনায় হিজরতের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলাম, তাই আমরা তোমাদের তুলনায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিক নিকটবর্তী। একথা শুনে হযরত আসমা দুঃখ ও রাগে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এমনটি কখনোই হতে পারে না। তোমরা তো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে থাকতে, তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের খাবার দিতেন, তোমাদের অজ্ঞদের উপদেশ দিতেন, অথচ আমরা আমাদের দেশ থেকে দূরে, প্রবাসে, দূরবর্তী শত্রু দেশে ছিলাম। সেখানে আমরা নানা ধরনের ভয় ও আতঙ্কে থাকতাম। আমরা এই সমস্ত দুঃখ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য সহ্য করেছি। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ততক্ষণ খাবার গ্রহণ করব না যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ, আমি ঠিক ততটাই বলব যতটা আপনি বলেছেন, এরচেয়ে কমও বলব না আর বেশিও না। পুরো কথা গিয়ে বলব। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ليس بها حق بي منكم وله ولاصحابه ہجرة واحدة ولكم انتم اهل السفينة هجرتان (লাইসা বিহা হাক্কা বী মিনকুম ওয়ালাহু ওয়ালিআসহাবিহী হিজরাতুন ওয়াহিদাতুন, ওয়ালাকুম আনতুম আহলাস সাফিনাতি হিজরাতানে) অর্থাৎ, সে তোমাদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখে না, বরং তার এবং তার সাথীদের জন্য একটি হিজরত, আর তোমাদের অর্থাৎ আবিসিনিয়ার দিকে জাহাজে ভ্রমণকারীদের জন্য দুটি হিজরত। এভাবে তিনি তাদের মনস্তুষ্টি করেন এবং তাদের দুঃখ দূর হয়। হযরত আসমা যখন একথা শুনেন, তখন তিনি গৌরব ও সৌভাগ্যের এই মর্যাদার কথা তার সাথীদের জানান। হযরত আসমা বর্ণনা করেন যে, তারপর আবিসিনিয়ার লোকেরা দলে দলে আমার কাছে আসত আর বড় আগ্রহের সাথে মহানবী (সা.)-এর এই মুবারক বাণী আমার কাছ থেকে শুনত। আর পৃথিবীর কোনো জিনিস তাদের এতটা আনন্দিত করত না এবং তাদের জন্য অন্য কোনো বিষয় এত মর্যাদাপূর্ণ ছিল না যতটা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই বাণী ছিল। তিনি বলেন, কিছু লোক বার বার আমার কাছে মহানবী (সা.)-এর এই বাণী শোনার জন্য আসত।

এখানে একজন আবিসিনীয় দাস, যে মুসলমান হয়েছিল, পরবর্তীতে যার শাহাদাত হয়, তার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, খায়বারের এক ব্যক্তির একজন আবিসিনীয় দাস ছিল ইয়াসার। সে তার পশুপাল চরাত। যখন সে খায়বারবাসীদের রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে দেখে তখন সে খায়বারবাসীদের জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য কী? তারা বলে, আমরা সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব যে নিজেকে নবী বলে। তার হৃদয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উল্লেখ ঘর করে নেয়, অর্থাৎ এই কথাটি তার হৃদয়ে গেঁথে যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোনো মর্যাদা আছে এবং নবী হওয়ার দাবি রয়েছে, অতএব নিশ্চয়ই কোনো বিষয় আছে। সে তার ছাগপাল নিয়ে বেরিয়ে যায় যাতে সেগুলো চরাতে পারে। মুসলমানরা তাকে পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসে। অরেকটি বর্ণনা কিছুটা বিস্তারিত, তা হলো এই যে, সে বর্ণনা অনুযায়ী সেই দাস নিজেই ছাগপাল নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসে। মহানবী (সা.) তার সাথে কথা বলেন। সে জিজ্ঞেস করে, আপনি কীসের দিকে আহ্বান করেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি আর এটি যে, তুমি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই আর আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তুমি আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। (তখন) সেই ক্রীতদাস বলে, আমি যদি এই সাক্ষ্য প্রদান করি তাহলে আমি কি লাভ করব আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলে আমি কি প্রতিদান পাবো? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করো তাহলে তোমার ঠিকানা হবে জান্নাত। অতঃপর সেই ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিঃসন্দেহে আমি এমন এক মানুষ যার বর্ণ কৃষ্ণ আর চেহারাও অসুন্দর, দুর্গন্ধময় এবং আমার কাছে সম্পদও নাই। আমি যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করি আর আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব কী? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তখন) হাবশী ক্রীতদাস বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই ছাগপাল আমার কাছে আমানত হিসেবে আছে। এগুলোর কী করব? মহানবী (সা.) বলেন, এগুলো সৈন্যদের মাঝ থেকে বের করে নিয়ে যাও এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমার আমানত তোমার পক্ষ থেকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ, এগুলো তার (তথা মালিকের) কাছে পৌঁছে যাবে। যারা এই আপত্তি করে যে, মুহাম্মদ (সা.) মালে গনিমত (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভের জন্য যুদ্ধ করেছেন আর বিশেষ করে খায়বারের বরাতেও এই আপত্তি করা হয় যে, ইহুদীদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অত্যাচার-নিপীড়ন করা হয়েছিল। একথা যদি সঠিক হতো তাহলে ঠিক যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের ছাগলের একটি পাল (এবং খায়বারে সাহাবীদের ক্ষুধার তাড়নায় যে অবস্থা ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন, খাবার মতো কিছুই ছিল না।) তখন তো এই ছাগপাল ছিল বিনামূল্যের গনিমত বা সম্পদ (এগুলো) ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু মহানবী (সা.) যুদ্ধাবস্থায়ও আমানতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ছাগপাল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। যাহোক, তিনি এমনটিই করেন। সেই ছাগপাল একত্র হয়ে রওয়ানা হয়, যেন কোনো রাখাল সেগুলোকে হাঁকাচ্ছে। পরিশেষে প্রতিটি ছাগল তার মালিকের কাছে পৌঁছে যায়। এরপর তিনি (ক্রীতদাস) সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেন। (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।) এমতাবস্থায় একটি তির তার শরীরে বিদ্ধ হয় আর তিনি শহীদ হয়ে যান। অথচ তিনি একটি সিজদাও করেন নি। (সবেমাত্র নতুন মুসলমান হয়েছিলেন। কোনো নামায-কালামও পড়েন নি।) মুসলমানরা তাকে তুলে নিজেদের সৈন্যদলের মাঝে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে তাঁবুতে নিয়ে

আসো। সাহাবীরা তাকে মহানবী (সা.)-এর তাঁবুতে নিয়ে আসেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, তার (ক্রীতদাসের) কাছে মহানবী (সা.) আগমন করেন এবং তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার চেহারাকে সুশ্রী বানিয়ে দিয়েছেন, তোমার দুর্গন্ধকে সুরভিত করে দিয়েছেন এবং তোমার সম্পদকে বৃদ্ধি করেছেন। তার জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। খায়বার অবরোধের দিনগুলোতে ধনাঢ্য এক ইহুদীর রাখাল, যে তার ছাগপাল চরাত, (সে) মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এখন তো আমি আর তাদের কাছে ফিরে যেতে পারব না। অথচ সেই ইহুদীর এই ছাগপাল আমার কাছে আমানত স্বরূপ আছে। এখন আমি এগুলোর কী করব? তিনি (সা.) বলেন, ছাগলগুলোর মুখ দুর্গ অভিমুখে করে সেগুলোকে হাঁকিয়ে দাও। খোদা তা'লা সেগুলোকে তাদের মালিকের কাছে পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি অনুরূপই করেন আর ছাগপাল দুর্গের কাছে চলে যায়, সেখান থেকে দুর্গবাসীরা সেগুলোকে ভেতরে নিয়ে যায়।

খায়বার অভিযানের সময় ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার মাংস ভক্ষণ করতে বারণ করেন। একইভাবে বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে- হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার মাংস এবং মুতা'র (বিয়ে) নিষিদ্ধ করেন।

মহানবী (সা.)-এর সাথে ফাদাকবাসীদের সন্ধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ফাদাক মদীনা থেকে ছয় রাতের দূরত্বে খায়বারের নিকটে অবস্থিত। যখন মহানবী (সা.) খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এর নিকটে পৌঁছান তখন তিনি মুহাইয়্যাছা বিন মাসঊদ (রা.)-কে ফাদাক অভিমুখে প্রেরণ করেন। যেন তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাদের ওপরেও আক্রমণ হতে পারে মর্মে তাদেরকে সতর্ক করেন কেননা তারাও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। অথবা কোনো না কোনোভাবে মুসলমানদের বিরক্ত করত কিংবা এমন কোনো কাজ করত যার ফলে কোনো না কোনোভাবে (মুসলমানদের) ক্ষতি হতো। তাই তিনি বলেন, তোমাদের ওপরেও আক্রমণ হতে পারে যেভাবে আমরা খায়বারের ওপর আক্রমণ করছি। হযরত মুহাইয়্যাছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের কাছে যাই এবং সেখানে দু-দিন অবস্থান করি কিন্তু তারা টালবাহানা করতে থাকে আর বলে, খায়বারে দশহাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য রয়েছে আর তাদের মাঝে আমের, ইয়াসার, হারিস এবং ইহুদীদের নেতা মারহাবের মতো মানুষ রয়েছে। আমাদের মনে হয় না- মুহাম্মদ (সা.) তাদের ধারেকাছে পৌঁছতে পারবে। হযরত মুহাইয়্যাছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের দুষ্কৃতি ও হঠকারিতা দেখে ফিরে আসার সংকল্প করি। এরপর তিনি (রা.) বলেন, তখন সেই গোত্রের লোকেরা বলে, আমরা আপনার সাথে আমাদের কয়েকজনকে প্রেরণ করছি যারা আমাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাবে। আর (অন্যদিকে) ভাবছিল, মহানবী (সা.) খায়বার জয় করতে পারবেন না। (তারা বলছিল যে, ঠিক আছে আমরা মানুষ পাঠাচ্ছি কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, খায়বার বিজয় হবে না। অতএব, তারা এভাবেই গড়িমসি করছিল আর বলছিল, আমরা মানুষ পাঠাচ্ছি।) এরইমধ্যে তাদের কাছে কয়েকজন মানুষ আসে আর তারা সংবাদ দেয় যে, মুহাম্মদ (সা.) 'নায়েম দুর্গ' জয় করেছেন। তখন ফাদাকবাসীরা ভয় পেয়ে যায়। আর তারা তাদের নেতাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে একটি দলসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে, যার নাম ছিল ইউশা

বিন নূন। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, আমাদের সাথে এই মর্মে সন্ধি করুন যে, আমাদের জীবন ভিক্ষা দেওয়া হবে আর আমরা নিজেদের সহায়-সম্পদ নিয়ে ফাদাক ছেড়ে চলে যাব। মহানবী (সা.) তাদের আবেদন গ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, ফাদাকবাসীরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এই শর্তে সন্ধি করেছিল যে, অর্ধেক জমি তাদের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক জমি মহানবী (সা.) নিয়ে নিবেন। যেহেতু এই বসতি বিনা-যুদ্ধে লাভ হয়েছিল তাই এটি মহানবী (সা.)-এর কাছে ফ্যায়-এর সম্পদ ছিল। অতএব, মহানবী (সা.) ফাদাকের প্রাপ্ত সম্পদ থেকে খরচ করতেন।

খায়বারের গনিমতের মাল এবং এর বণ্টন সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে খায়বার অভিমুখে যাই আর গনিমতের সম্পদে আমরা সোনা ও রূপা পাই নি। কেবল উট, গবাদি পশু, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী এবং বাগান পেয়েছিলাম। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে- ধন-সম্পদ, কাপড়চোপড় ও বিভিন্ন সামগ্রী ছিল। কেবল কয়েকটি দুর্গ থেকে প্রাপ্ত যে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তার বিবরণ হলো, এক হাজার বল্লম, চারশ তরবারি এবং পাঁচশ ধনুক পাওয়া গিয়েছিল। বুশায়ের বিন ইয়াসার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) খায়বারকে সর্বমোট ছত্রিশ ভাগে ভাগ করেছিলেন। তিনি (সা.) এর মধ্য হতে অর্ধেক, অর্থাৎ আঠারো ভাগ মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করেন যার মাঝে প্রত্যেকটি একশ ভাগ সংবলিত ছিল অর্থাৎ, (মোট) এক হাজার আটশ ভাগ ছিল। অন্যান্যদের মতো মহানবী (সা.)-এরও এখান থেকে একটি অংশ ছিল অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিজের অংশও অন্যান্যদের মতোই সমান ছিল। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ ছিল এবং পদচারীদের জন্য একটি অংশ ছিল। মহানবী (সা.) বাকি অর্ধেক নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অবস্থা, নানাবিধ উদ্ভূত পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মুকাবিলা করার জন্য। সেগুলো রিজার্ভ ফান্ডে চলে গিয়েছিল আর এগুলো ওয়াতীহ, কাতীবা ও সুলালেম এবং এদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এগুলো সেখানকার সম্পদ ছিল।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, কাতীবা থেকে (প্রাপ্ত গনিমতের মাঝে) আল্লাহ্ তা'লার খুমুস, মহানবী (সা.)-এর অংশ, নিকটাত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকীনদের অংশ, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদের ব্যয়ভার আর সেসব লোকের অংশ নির্ধারণ করা হয় যারা মহানবী (সা.) এবং আহলে ফাদাকের মধ্যে দূত হিসেবে কাজ করতেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত মুহাইসা বিন মাসউদ (রা.)। মহানবী (সা.) তাদেরকে সেখান থেকে ৩০ ওয়াসাক যব এবং ৩০ ওয়াসাক খেজুর প্রদান করেছিলেন। ১ ওয়াসাক সমান ৬০ সা আর ১ সা সমান কমপক্ষে ২১/২ (আড়াই) কেজি। এ হিসাবে প্রায় ৪,৫০০ কেজি যব এবং ৪,৫০০ কেজি খেজুর প্রদান করা হয়েছিল। খায়বারের গনিমত সাধারণভাবে কেবল তাদের মাঝে বণ্টন করা হয় যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন। যদিও এর ব্যতিক্রম হিসেবে তারা ছাড়া হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আমরকে অংশ প্রদান করা হয়েছিল। আর একইভাবে হাবশা-ফেরতবাসী এবং হযরত আবু হুরায়রা প্রভৃতি কিছু মানুষকেও গনিমত থেকে প্রদান করা হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর জন্য যে খুমস ছিল তা থেকে অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করতেন এবং এ থেকে আহলে বায়তকে দিতেন, বনু মুত্তালিবকেও দিতেন আর তাদের এতিম নারীদের ও অভাবীদেরও প্রদান করতেন। ইবনে ইসহাক লেখেন, খায়বারে বণ্টকারীদের বনু সালামা গোত্রের জাব্বার বিন সাখার আনসারী এবং (অপরজন হলেন) বনু নাজাদ গোত্রের যায়েদ বিন সাবেত। এরা উভয়েই হিসাব করে বণ্টনকারী ছিলেন। ইবনে সা'দ লেখেন, মহানবী (সা.) গনিমতের ধনসম্পদ একত্রিত করার

নির্দেশ দেন। ফলে মালামাল সব একত্রিত করা হয়। এরপর ফারওয়া বিন বাইয়্যাযিকে নিগরান নিযুক্ত করা হয় এবং হিসাবরক্ষক হিসেবে হযরত যায়েদ বিন সাবেতকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল বর্ণনা করেন, আমিও এক বাক্স পাই। অপর বর্ণনায় এসেছে, বাক্সটি চর্বিতে ভরা ছিল। আমি বললাম, আমি এ থেকে কাউকে কিছু দেবো না। আমি তাঁর (সা.) পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় লজ্জানুভূত হয়, তাই সেটিকে বগলে (আড়াল) করে নিয়ে নিজে সঙ্গীসাথিদের কাছে যাই এবং লুকিয়ে ফেলি। পথিমধ্যে গনিমতের মালামালের নিগরানের সাথে দেখা হয়। সে এর কোনা ধরে টেনে বলে, এদিকে আসো, আমরা এটি বন্টন করব। আমি বললাম, কখনো না। আল্লাহ্ তা'লার কসম! আমি তোমাকে এটি কখনোই দেবো না। সে আমার কাছ থেকে সেই বাক্স টানতে আরম্ভ করে। (ইত্যবসরে) তিনি (সা.) দেখে ফেলেন এবং হেসে দেন। অতঃপর নিগরানকে বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। ফলে সে আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর আমি নিজের মালামাল নিয়ে সঙ্গীসাথিদের কাছে পৌঁছাই এবং আমরা সেগুলো খাই। এই হলো নিজ সাহাবীদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহের দৃষ্টান্ত! অর্থাৎ ঠিক আছে, সে যখন নিয়েই নিয়েছে, তাই তাকে নিতে দাও।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ইবনে লুকায়েমকে পোষা মুরগী এবং পোষা পশুপাখি প্রদান করেন। অর্থাৎ যা-ই থাকত তার সবটাই বন্টন করা হতো।

খায়বারে অংশগ্রহণকারী মহিলাদেরকেও প্রদান করা হয়। ইবনে ইসহাক লেখেন, খায়বারে মহানবী (সা.)-এর সাথে মুসলমানদের কিছুসংখ্যক নারী উপস্থিত ছিল, তাই তিনি (সা.) তাদেরকে মালে গনিমত থেকে কিছু প্রদান করেন। যদিও (তাদের জন্য) গনিমতের ধনসম্পদ থেকে নিয়ম অনুযায়ী অংশ নেওয়া হয় নি। বনু গিফার একজন নারী বলেন, আমি বনু গিফার গোত্রের কতিপয় মহিলার সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম। আমরা সবাই বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার সঙ্গে বের হতে চাই," (তখন তিনি (সা.) খায়বারের দিকে যাচ্ছিলেন।) আমরা বললাম, "আমরা আহতদের সেবা করব এবং মুসলমানদের সাহায্য করব।" তখন তিনি (সা.) বললেন, "আল্লাহর বরকতের সঙ্গে চল, ঠিক আছে, তোমরা আসতে পার।" আমরা তাঁর (সা.) সঙ্গে রওনা দিলাম।

মহানবী (সা.) যখন খায়বার জয় করলেন, তখন তিনি (সা.) আমাদেরকেও যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে অংশ দিলেন। মহানবী (সা.) একবার একটি হার ধরলেন এবং আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারিনী বলেন, "আল্লাহর কসম! সেই হার আমার গলায় সবসময় ছিল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও আমি তা গলা থেকে খুলি নি। এই সাহাবীয়া ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন, যেন এই হার তার কবরে দিয়েই তাকে গোরস্ করা হয় এবং যে গিঁঠটি নবীজী লাগিয়েছেন তা কেউ যেন না খোলে।" বলা হয়, বনু গিফার গোত্রের এই সাহাবিয়ার নাম ছিল উমাইয়্যাহ বিনতে কায়েস আবু সালত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম এবং আমার স্ত্রীও সঙ্গে ছিল, সে গর্ভবতী ছিল। পথে তার সন্তান প্রসব হলো। আমি মহানবী (সা.)-কে খবর দিলাম। তখন তিনি (সা.) বললেন, "তার জন্য কিছু খেজুর পানিতে ভিজিয়ে দাও এবং ভালোভাবে ভিজে গেলে সেই পানি তাকে পান করাও।" (অর্থাৎ খেজুর পানিতে ভিজিয়ে দিবে আর তা জুস হলে তাকে পান করাবে) আমি তাই করলাম ফলে সে সন্তান জন্মদানের পর আর কোনো কষ্ট পায় নি। [অর্থাৎ প্রসব পরবর্তী সময় প্রসূতির যে দুর্বলতা থাকে তার সেই দুর্বলতা দূর হয়ে যায়]

আমরা যখন খায়বার জয় করলাম, তখন নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা করে অংশ নির্ধারণ করা হয় নি, তবে তিনি (সা.) ফ্যায়-এর মাল থেকে তাদেরকেও দিলেন। ফাদাকের সম্পদ থেকে। আমার স্ত্রীকেও দিলেন এবং সেই শিশুকেও দিলেন যে পথিমধ্যে জন্মেছিল।

এখানে তওরাতের কিতাব ইহুদীদের ফেরত দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, খায়বারের দুর্গ থেকে যখন মালামাল একত্র করা হয় তখন সেই মালামালের মধ্যে কিছু তাওরাতের কিতাবও পাওয়া যায়। ইহুদীরা এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে তাদের কিতাব ফেরত চায়। তিনি (সা.) তা নিরাপদে তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। [হস্ত লিখিত তওরাত ফেরত দিয়ে দেন]। এটা ছিল মহানবী (সা.)-এর ধর্মীয় সহনশীলতা এবং অন্য ধর্মের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদের তওরাত তাদেরকে নিরাপদে ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। আজকের মতো নয় যে, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা করে কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তো এই আদর্শ দেখিয়েছিলেন যে, তাদের ধর্মীয় পুস্তক সুরক্ষিত রাখো এবং তাদেরকে ফেরত দিয়ে দাও।

খায়বার বিজয় শেষে প্রত্যাবর্তনকালে কুরা উপত্যকার যুদ্ধাভিযানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) খায়বার জয় করে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন, তারপর ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে ফিরে যাওয়ার সময় কুরা উপত্যকায় ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এটি খায়বার ও তিমা'র মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে বহু জনপদ ছিল। এটিকে ওয়াদিউল কুরা বলা হয়। পূর্বে এখানে আদ ও সামুদ জাতি বাস করত। কুরআন শরীফেও এই দুটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইসলামের পূর্বে ইহুদীরা এখানে বসতি গড়ে তোলে এবং কৃষি ও পানি সেচ ব্যবস্থায় উন্নতি করে, ফলে এটি ইহুদীদের একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

এই সময়ের হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)-এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, "আমরা খায়বার জয় করি। এরপর আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরা উপত্যকায় পৌঁছাই। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর একজন দাস ছিল, যাকে মিদাম নাকে ডাকা হতো। তাকে বনু যুবাব গোত্রের কেউ উপহার হিসেবে মহানবী (সা.)-কে দিয়েছিল। যখন সে নবীজী (সা.)-এর উটের জিন খুলছিল, তখন হঠাৎ এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে এবং সে নিহত হয়। মানুষ বলতে লাগল, তার শাহাদাত কল্যাণকর হোক।

মহানবী (সা.) বললেন, না, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! সেই চাদর তার ওপর আগুন হয়ে জ্বলছে, যেটি সে খায়বারের দিন গনিমতের মাল থেকে নিয়ে নিয়েছিল। অথচ তখনও তা বণ্টন করা হয় নি। [অর্থাৎ যে গনিমতের মাল একত্রিত হচ্ছিল, সেখান থেকে সে উক্ত চাদরটি চুরি করে নিয়েছিল।] এক ব্যক্তি যখন মহানবী (সা.)-এর মুখ থেকে এ কথা শুনলো, [তখন সে অনুভব করল এ তো বড় ভয়ানক কথা। চাদর চুরি করার ফলে সে জাহান্নামে যাচ্ছে] তখন সে একটি ফিতা বা দুটি ফিতা নিয়ে আসে আর নিবেদন করে, আমি এগুলো গনিমতের মাল থেকে নিয়েছিলাম [অর্থাৎ আমিও বণ্টনের পূর্বে নিজ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম]। তখন মহানবী (সা.) বলেন, একটি ফিতা হোক বা দুটি ফিতা– এগুলো আগুনে নিক্ষেপ করার কারণ হতে পারে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও চুরি করলে তা তোমাদের শাস্তির কারণ হবে।

যাহোক, এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ অনুযায়ী মহানবী (সা.) সেখানের ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করেন। একটি পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাকে, একটি হযরত হুবাব বিন মুনযিরকে, একটি হযরত সুহায়েল বিন হুনাইফকে এবং একটি হযরত আব্বাদ বিন বিশরকে প্রদান করেন। এরপর মহানবী (সা.) ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণের

আহ্বান জানালেন এবং বললেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা পাবে এবং তাদের বিচারের দায়ভার আল্লাহ্‌র ওপর থাকবে। কিন্তু ইহুদীরা অস্বীকৃতি জানাল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল।

প্রথমে এক ইহুদী মল্লযুদ্ধের জন্য এগিয়ে এল, হযরত যুবায়ের (রা.) তাকে হত্যা করলেন। এরপর আরেকজন ইহুদী এল, হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করলেন। এরপর আরেকজন ইহুদী এলে হযরত আবু দুজানা (রা.) তাকে হত্যা করলেন। এভাবে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলল এবং মোট ১১ জন ইহুদী নিহত হলো। পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করল এবং মহানবী (সা.) কুরা উপত্যকা জয় করলেন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে বসবাসকারী ইহুদীদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য গনিমত স্বরূপ দিলেন আর এতে মুসলমানরা অনেক গনিমতের মাল লাভ করল। মহানবী (সা.) কুরা উপত্যকাতেই মুসলমানদের মাঝে মালে গনিমাত বণ্টন করলেন এবং ইহুদীদের জমি ও খেজুর বাগান তাদের করায়ত্তে দিয়ে তাদেরকে এর তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিলেন যেভাবে খায়বারের ইহুদীদেরকে তাদের সম্পদের করায়ত্ব দিয়েছিলেন অর্থাৎ ঠিক আছে, তোমরা এগুলো তোমাদের করায়ত্তে রাখো এবং উৎপাদিত শস্য থেকে উপার্জন করে নির্ধারিত অংশ দিও।

আল্লামা বালাযুরি বলেন, মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন সাঈদ বিন আস (রা.)-কে কুরা উপত্যকার শাসক নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখানে চার দিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

(পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।)

এখন কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হবে, এবং তাঁদের জন্য জানাযার নামাজও পড়া হবে (জানাযায়ে গায়েব)।

প্রথম স্মৃতিচারণ মাওলানা মোহাম্মদ করিম উদ্দিন শহিদ সাহেবের, যিনি ছিলেন সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ান। রমযানের মাঝেই তিনি ইন্তেকাল করেন, মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৭ বছর, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তাঁর পিতা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'ত-এ যোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত চাকরি করতেন। তাঁরা গ্রামে থাকতেন, যেখানে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা ছিল না। তাই কলকাতার হায়দারাবাদের চিনতাকুনটার সেঠ মোহাম্মদ মোঈনউদ্দিন সাহেব তাঁকে লেখাপড়ার জন্য কাদিয়ানে প্রেরণ করেন। ১৯৫৪ সালে লেখাপড়ার জন্য মাদরাসায়ে আহমদীয়াতে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে পাঠ শেষ করেন এবং এরপর 'মৌলভী ফাযেল' পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৬০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চন্ডীগড় থেকে উক্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। পরে আরও শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি রাবওয়া যান এবং সেখানে দুই বছর জামেয়া আহমদীয়া-তে অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি 'শাহেদ' ডিগ্রি অর্জন করেন। এভাবে, ভারতে 'শাহেদ' ডিগ্রি অর্জনকারী প্রথম মোবাল্লেগ তিনি ছিলেন। কাদিয়ানে তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, কাদিয়ান-এর একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত উক্ত দায়িত্বে বহাল ছিলেন। এরপর তিনি বাইরের দেশের জন্য এডিশনাল নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্বও পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সদর উমুমী হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য হয়। ওয়াকফে জাদীদের সদর হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরে তিনি জামেয়ার প্রিন্সিপাল হন এবং দুই মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দারুল কাযা-র সদর এবং মজলিস কারপরদাজের সদর হিসেবেও দায়িত্ব

পালন করেন। ২০২১ সালে আমি তাকে 'সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া' নিযুক্ত করেছিলাম এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কাদিয়ানের নাযেরে আ'লা ইনাম ঘৌরী সাহেব বলেন, মরহুম ছিলেন অত্যন্ত সরল স্বভাবের ও সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপনকারী একজন মানুষ, এবং এটাই সত্যি। আমি নিজেও তা দেখেছি। মরহুম জামা'তের পক্ষ থেকে যে ভাতা পেতেন, তার মাধ্যমেই সাদা-সিধে জীবন অতিবাহিত করতেন এবং ধার করে খরচ করতে তিনি খুব অপছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর হস্তলিপির অধিকারী এবং একজন উচ্চমানের কাতেব (লেখক)। যতদিন না কম্পিউটারে টাইপিং শুরু হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত 'বদর' পত্রিকা এবং জামা'তের অন্যান্য বই ও সাময়িকীর হস্তলিখিত লেখার কাজ তার মাধ্যমে হতো। তিনি সুবক্তাও ছিলেন এবং প্রবন্ধ লেখকও ছিলেন। কাদিয়ানের বার্ষিক জলসা এবং অন্যান্য জামা'তী প্রোগ্রামে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেতেন। এমটিএ-তে কাদিয়ান থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত 'রাহে হুদা' প্রোগ্রামে দীর্ঘ সময় তিনি প্রশ্নোত্তর দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন, শরীরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি সাহসের সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তার জীবনযাপন ছিল সত্যিই অনুসরণযোগ্য। বিগত ২০২৪ সালের কাদিয়ান জলসায় সভাপতিত্বও তিনি করেছেন। অসুস্থতা এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের পরেও তিন দিন ধরে সভাপতিত্ব করেন এবং জলসার উদ্বোধনও করেন। একইভাবে, মজলিসে শূরার সভাপতিত্ব করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে জামা'তের খেদমতের জন্য বাহাষট্টি (৬২) বছরের দীর্ঘ সময় দান করেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি পরিবারকে বলতেন যে, "আমার জন্ম রমযান মাসে হয়েছে, এখন দেখতে চাই, আমার মৃত্যু রমযানে হয় কি না?" এবং বাস্তবেই ২৭শে রমযান তাঁর মৃত্যু হয়। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি ছিলেন পরিশ্রমী ও বিনয়ী মানুষ। সবসময় চেষ্টা করতেন নিজের কাজ নিজে করতে, কারও ওপর বোঝা হতে চাইতেন না। এমনকি ব্যক্তিগত কাজগুলোও নিজেই করতেন। তিনি ছিলেন এক আ'মলদার আলেম। ওয়াকফের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং সেটা তিনি পূর্ণভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

তার প্রথম বিবাহ হয়েছিল ইকবাল বেগম সাহেবা'র সঙ্গে, যার মাধ্যমে তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তার সন্তান, মেয়ে, জামা'তা ইত্যাদি সবাইকেই দ্বীনের খেদমতের সুযোগ লাভ হচ্ছে। আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্যেও দ্বীনের খেদমতের এই প্রেরণা জারি রাখুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ আব্দুর রশীদ ইয়াহইয়া সাহেবের, যিনি কানাডার কাজা বোর্ডের সদর ছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। ৭৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তাঁর পিতা প্রায় ১৯৪৫ সালের দিকে মওলানা সানাউল্লাহ আমৃতসরি, মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী এম.এ. সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর, গবেষণা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পুরো গ্রামে একমাত্র আহমদী এবং ধর্মীয় মতপার্থক্য সত্ত্বেও গ্রামের মানুষজন তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়া থেকে বি.এ. ডিগ্রি গ্রহণের পর জামেয়া আহমদীয়া-তে ভর্তি হন এবং নিজ জীবন ওয়াক্ফ করেন আর

১৯৭৫ সালে সেবার ময়দানে উপস্থিত হন। প্রথম দিকে পাকিস্তানে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োগ পেয়েছেন। পরে আমেরিকা, কানাডা, গুয়াতেমালা-সহ বিভিন্ন দেশে সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মিশনারি ইনচার্জ হিসেবেও খিদমতের সুযোগ পান। গুয়াতেমালা ও দক্ষিণ কোরিয়াতে তিনি মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও ন্যাশনাল সদর হিসেবেও সেবাদানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জামেয়া আহমদীয়া, কানাডায় ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং সেখানে তিনি তাফসীরে কুরআন ও ইলমুল কুরআনের ক্লাসও নিতেন। ২০১৭ সালে তাঁকে কানাডার কাযা বোর্ডের সদর নিযুক্ত করা হয় এবং ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। গুয়াতেমালায় অবস্থানকালে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরু দালাইলামার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে ইসলামের বার্তা প্রদান করেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র ও তিন কন্যা এবং অপর এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর ছেলে কাসিম রশীদ বলেন, তাঁর পিতা জামা'তের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জামা'তের বিরুদ্ধে কোন কথাই তিনি সহ্য করতে পারতেন না, আর জামা'তের নেযামের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আপত্তি করা হলে এর পরিপূর্ণ উত্তর দিতেন। আপত্তিকারীর কথা ভালোভাবে শুনে তার ভুল অনুধাবন করিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে সবসময় জামা'তে নামাজ এবং বিশেষ করে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। যতই অসুস্থতা থাকুক না কেন, জামা'তে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতেন। শেষ অসুস্থতার সময়েও এটাই ছিল তাঁর অবস্থা। শেষ বর্ষে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তিনি ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অসুস্থতাও সহ্য করেছেন এবং সর্বদা "আলহামদুলিল্লাহ" বলতেন, এটিই তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। তিনি নিজের সন্তানদের বারবার এই উপদেশ দিতেন যে, খিলাফতের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকবে।

তাঁর ছেলে বলেন, তিনি আমাকে সবসময় সাহস দিতেন যেন আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে খিলাফতের সম্পর্কে সাহসিকতা ও গর্বের সাথে লিখি, কারণ এটাই মুসলিম বিশ্বের এবং পুরো মানবতার ঐক্যের প্রকৃত সমাধান। তিনি তাঁর ওয়াকফকে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে যখন এম.টি.এ. চালু হয় নি, তখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এবং খলীফা সালেস (রাহে.)-এর খুতবা নিজ হাতে কপি করে, তার অনুলিপি তৈরি করে ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তা মানুষজনের কাছে পৌঁছে দিতেন, যাতে যুগ-খলীফার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং (জামা'তের সদস্যদের সাথে খলীফার) সম্পর্ক বজায় থাকে।

তাঁর ভাগ্নে মনসুর নূরুদ্দীন সাহেব, যিনি রাবওয়ায় মোবাল্লেগ, বলেন যে, প্রায় ৫৩ বছর ধরে তিনি ওয়াকফের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে পালন করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সবসময় ওয়াকফের সাথে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক এবং নেযামে জামা'তের প্রতিনিধি হিসেবে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা আর যুগ-খলীফার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল এবং খলীফার প্রেমিক হিসেবে দেখেছি।

তিনি যখন জামেয়াতে নিযুক্ত হন, তখন তিনি তাঁর লেকচারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন যাতে জামেয়ার ছাত্ররা আদর্শ ছাত্র ও আদর্শ মুরব্বী, আদর্শ মোবাল্লেগ হয়ে বের হয়। তিনি বলতেন, "যুগ-খলীফা জামেয়ার ছাত্রদের পড়ানোর জন্য আমার ওপর ভরসা করেছেন, তাই এই আস্থার যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে।"

মির্যা মুহাম্মদ আফজাল সাহেব বলেন, মুরব্বী ছিলেন মার্জিত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। জামাতের সেবাকে প্রত্যেক কাজের ওপর প্রাধান্য দিতেন ও সহযোগীতা করতে দ্বিধা করতেন না।

আব্দুন নূর আবেদ সাহেব বলেন, আমাদেরকে কুরআনের তফসীর পড়াতেন। অনেক ভালোবাসা ও পরিশ্রমের সাথে পড়াতেন। অনেক নোটস লেখাতেন এবং পরে মনোযোগের সাথে চেক করতেন। তাঁর পড়ানো সেসব নোট আজকেও আমাদের কাজে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ সিন্ধুর হায়দারাবাদ জেলার আমীর মির্যা ইমতিয়াজ আহমদ সাহেবের, যিনি মির্যা নযীর আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর বংশে আহমদীয়াত তাঁর দাদা মুকাররম ইলম দীন সাহেব মরহুমের মাধ্যমে হয়েছিলো, যিনি প্রথম খেলাফতের যুগে প্রথমে লিখিত ও পরে কাদিয়ান গিয়ে কাদিয়ান জলসার সময় হাতে হাত রেখে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। মির্যা ইমতিয়াজ সাহেব মরহুম বি.এ. পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করার পর নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা আরম্ভ করেন। মেডিকেল স্টোর খুলেন। মরহুমকে আল্লাহ্ তা'লা যৌবন থেকে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দরিদ্র ও অভাবীদের নীরবে প্রচুর সাহায্য করতেন। তাঁর পুত্র এটি লিখেছেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের পিতার জানাযায় সানজার চাঙ্গ থেকে আগত এক শিয়া বন্ধু বলেছেন, আমি নামায পড়ার নিয়ম জানতাম না, আর রোযা সম্পর্কেও আমার কোন জ্ঞান ছিল না। ইসলামী শিক্ষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে আমি জানতামই না। ইমতিয়াজ সাহেব আমাকে নামায পড়া ও রোযা রাখা শিখিয়েছেন। অথচ আজকে আমরাই সেখানে অমুসলিম আখ্যায়িত হই। এরপর আমি কখনো নামায পরিত্যাগ করি নি এবং নিয়মিত ইবাদত করি। মির্যা মশহুদ সাহেব মুরব্বী লিখেন, পবিত্রচেতা, ঈমানদারী ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে এলাকার অনেক সিন্ধু জমিদারদের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিলো। অ-আহমদীরা তাঁর কাছে আমানত রাখতো। হায়দারাবাদ জেলার সাবেক কায়েদ শাহবাজ সাহেব লিখেন- বিশ্বস্ত, বিনয়ী, অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণকারী, খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার জন্য আত্মমর্যাদা পোষণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রোগীদের কাছে যদি অর্থ না থাকতো তাহলে নিজের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়ে দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে বহু মানুষ এসেছিল দুঃখ প্রকাশ করতে, আর সবার বক্তব্য ছিল তাঁর মৃত্যুতে আমাদের এলাকাতে একটি শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আলজেরিয়ার মুকাররম আলহাজ্ব মুহাম্মদ বিল আরাবী সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি আলজেরিয়ান ছিলেন বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করতেন। ২০১৫ সালের যুক্তরাজ্যের জলসাতে সস্ত্রীক অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বয়আত করে ফেরত যান। জলসার প্রথমদিনই এই স্থানের সাথে তাঁর এক অদ্ভুত ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন যেন তিনি পূর্বেও এখানে এসেছেন। তিনি বলেন, তিনি কয়েক বছর যাবত এই স্থান ও এর পরিবেশ স্বপ্নে দেখেছেন। বয়আতের একদিন পূর্বেও তিনি একই রকম স্বপ্ন দেখেন যার ভিত্তিতে সস্ত্রীক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জলসায় ফ্রান্স থেকে তাঁর পরিবারের আহমদি ও অ-আহমদী সদস্য সহ মোট

৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ৮ জন জলসা চলাকালীন সময় তাঁর অনুসরণে বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি নিজ সন্তানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখানোর অনেক চেষ্টা করতেন। নামায ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন।

তাঁর সন্তানরা তাঁর পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন। তাঁর সন্তানরা বলেন, আমাদের পিতা আমাদের এমনভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আমাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রতি গভীর প্রেম ও আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে আমাদের জন্য আহমদীয়াত গ্রহণ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পরিবারে আহমদীয়াত আসে তাঁর বড় ছেলে মোহাম্মদ বিল আরাবির মাধ্যমে। যিনি একদিন স্যাটেলাইট চ্যানেলের সেটিং ঠিক করছিলেন। তখন হঠাৎ এমটিএ সামনে চলে আসে এবং তিনি সেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কে দেখতে পান। পরবর্তীতে তিনি আহমদীয়াত এবং বিশেষত হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করেন এবং অবশেষে ১৯৯৫ সালের যুক্তরাজ্য সালানা জলসায় বয়আত গ্রহণ করেন। তার বয়আতের প্রায় ২০ বছর পর তার পিতা বয়আত গ্রহণ করেন অর্থাৎ ছেলে আগে (বয়আত) করেন। মরহুম প্রায়ই ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়া যাওয়া-আসা করতেন। ২০১৭ সালে পুলিশ আলজেরিয়ায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় এবং তাঁর সন্তানদের আহমদী হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। সেই মুহূর্তে তিনি অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। যখন তিনি পুলিশ স্টেশনে পৌঁছান তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি আহমদী কি না? তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় বলেন হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমি আহমদী। তিনি জানান তিনি আইনকে সম্মান করেন তবে যেদিন কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেবে সেদিন তাঁর বাড়িই হবে আহমদিয়া জামাতের প্রথম কেন্দ্র। তিনি খুব স্পষ্টভাবে ও সাহসিকতার সাথে কথাগুলো বলেন। খেলাফত এবং যুগ খলীফার প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। জামাতের সেবার প্রতি তার গভীর উদ্দীপনা ছিল। বহু বছর ধরে ফ্রান্সে তাঁর বাড়ি (জামাতের) বিভিন্ন বৈঠক ও জুমআর নামাজের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আলহাজ্জ মোহাম্মদ বিল আরাবি সাহেব তাঁর পেছনে ৮১ বছর বয়সী বিধবা স্ত্রী ও ৮ সন্তান রেখে গেছেন। যাদের মধ্যে ৭ জন আল্লাহ্‌র ফজলে আহমদী। তাঁর এক ছেলে ফ্রান্সের সেক্রেটারি তবলীগ ও ফ্রান্সের আরবি ডেস্কের ইনচার্জ। তাঁর কন্যারাও ধর্মের সেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

আলজেরিয়ার এক আহমদী লিখেন, আলহাজ্জ মোহাম্মদ সাহেব খুবই সৎ ও উদার মনের মানুষ ছিলেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, তিনি যুগ ইমামকে চেনার এবং তাঁর উপর ঈমান আনার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি বলতেন যুগ ইমামের (হাতে) বয়আত করার পর আমার ঈমান আরও দৃঢ় ও বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে।

আলজেরিয়ার আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব বলেন, তিনি প্রতিটি জামা'তি অনুষ্ঠান বা সভার জন্য নিজের ঘর খুলে দিতেন। এমনকি নিজ বাড়ির একাংশ নামায সেন্টার হিসেবে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। আলজেরিয়ার এক আহমদী বলেন আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক ছিল সুগভীর এবং তাকওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সর্বাবস্থায় যথাসময়ে নামায পড়ার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। এমনকি কঠিন অসুস্থতার সময়েও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেছেন। অত্যন্ত বিনয় ও ব্যাকুলতার সাথে এবং পূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করুন এবং তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে হায়দ্রাবাদ জেলার মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব কোটরি। তিনিও সম্প্রতি ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি নাভিদ আশরাফ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ কঙ্গো-এর পিতা ছিলেন। যিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। তাদের পরিবারে আহমদীয়াত তার দাদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত নূর এলাহী সাহেব (রা.) মাধ্যমে এসেছিল।

কঙ্গোর মুরব্বি সিলসিলাহ নাভীদ আশরাফ সাহেব লিখেন- বাবার ধর্মের প্রতি গভীর ভালবাসা এটি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী ও মহৎ স্বভাবের অধিকারী, অত্যন্ত দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী এবং খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক রক্ষাকারী। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। **১৯৯২** সালে কয়েক দিনের জন্য আল্লাহ্ পথে বন্দী হওয়ার সম্মানও তিনি লাভ করেছিলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের কালাম অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে পাঠ করতেন আর প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে সেই কালাম গেঁথে যেত, তাঁর কণ্ঠ অনেক সুমধুর ছিল। তার মৃত্যুতে এক ঘোর বিরোধীও শোক জানাতে এসেছিল এবং সে বলেছিল যে, মরহুম খুব পুণ্যবান এবং ভালো মানুষ ছিলেন। এমন ভালো মানুষ কখনো দেখি নি।

১৯৯২ সালে কোটরিতে তীব্র বিরোধিতার সময় তিনি বিরোধী দলের সামনে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। মৃত্যুর একদিন আগেও তিনি আমেলার সভায় অংশ নেন এবং নিজের চাঁদা প্রদান করেন এবং মৃত্যুর দিন তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, ফজরের নামাজ আদায় করেন, এরপর পৌনে আটটার দিকে তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হন।

শাহবাজ আহমদ সাহেব, সাবেক কায়েদ হায়দারাবাদ, তিনি বলেন, তিনি অত্যন্ত খেদমতকারী, জামাতের প্রতি আত্মাভিমান প্রদর্শনকারী, অত্যন্ত সাহসী মানুষ এবং তবলীগের জন্য অসাধারণ উদ্যমী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি আমি তার মাঝে দেখেছি তা হল, তিনি এমনভাবে সেবা করতেন যেভাবে একজন মানুষ প্রতিদিনের ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত কাজ করে থাকেন। এভাবে ধর্মের সেবা করতেন। তিনি বলেন, তিনি একটি কোম্পানিতে চাকরি করতাম। একসময় জামাতের বিরোধিতা অনেক বেড়ে যায়। মৌলভীরা ব্যবস্থাপকদেরকে জিজ্ঞাসা করে আর অনেক চাপ সৃষ্টি করে তাকে বের করে দেওয়ার জন্য। জেনারেল ম্যানেজার যিনি ছিলেন তিনি মৌলভীদেরকে বলেন, আপনারা বাদ দেন যে তিনি আহমদী বা তিনি কাদিয়ানী অথবা তিনি মির্যাই। আমাকে একটি বিষয়ে বলুন, তার মাঝে কী দোষ বা ভুল আছে তা ধরিয়ে দিন যার ভিত্তিতে আমরা তাকে কোম্পানি থেকে বের করে দিতে পারি। এতে মৌলভীরা কোনো উত্তর দিতে পারে নি এবং এভাবেই তার চাকরি চলতে থাকে। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গেছেন। বংশধররাও রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)